بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২রা জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকের জুমুআ নববর্ষ অর্থাৎ, ২০১৫ সনের প্রথম জুমুআ। আমার কাছে বিভিন্ন মানুষের নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণী আসছে। অনেকেই ফ্যাক্সও করছেন আবার মৌখিকভাবেও শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকেন। আপনাদের সবার জন্যও এই নববর্ষ সকল অর্থে কল্যাণকর হোক। কিন্তু একইসাথে আমি এ কথাও বলব যে, পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো তখনই আমাদের জন্য কল্যাণজনক হবে যদি আমরা এটি খতিয়ে দেখি যে, গত বছর আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব কতটা পালন করেছি? আর ভবিষ্যতে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা কতটা বদ্ধপরিকর? তাই ভবিষ্যতকে সামনে রেখে এই জুমুআয় আমাদের এমনভাবে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যা নতুন বছরে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের ভেতর কর্মোদ্দীপনা এবং পরিশ্রমের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করবে।

এটি স্পষ্ট যে, আহমদী হিসেবে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পুণ্য কর্মের মাধ্যমেই সে দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে। কিন্তু সেই নেকী এবং পুণ্যের মানদন্ড কী হওয়া উচিত? এ সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যক যে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আহমদীয়াতভুক্ত হয় এবং যে আহমদী তার জন্য এই মানদন্ড স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নির্ধারণ করে গেছেন। সেই মানদন্ড কী তা তিনি উল্লেখ করে গেছেন। আর এখন তো নিত্য-নতুন উপায় উপকরণ এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার যুগ খলীফার কাছে এই অঙ্গীকার করে যে, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত মানে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর আহমদীদের জন্য এই মানদন্ডের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এগুলো বয়আতের দশটি শর্ত মাত্র কিন্তু এতে আহমদী হওয়ার সুবাদে যে দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর ওপর বর্তায় তার সংখ্যা ভাসা দৃষ্টিতেও যদি নেয়া হয় তবুও ত্রিশের অধিক দাঁড়ায়। অতএব যদি সত্যিকার অর্থে নতুন বছরের আনন্দ আমাদের উদযাপন করতে হয় তাহলে এ কথাগুলো দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। নতুবা যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়ে শুধু এটি নিয়েই আনন্দিত হয় যে, আমি ঈসার মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করলাম বা আগমনকারী ঈসা যার আসার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাকে মেনেছি এবং তাঁর ওপর ঈমান এনেছি– শুধু এটি যথেষ্ট নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সঠিক পথের পানে এটি প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আমাদের কাছে প্রত্যাশা হলো, আমরা পুণ্যের মাঝে অবগাহন করে, সেগুলো বুঝে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হব এবং পাপ থেকে নিজেদের সেভাবে রক্ষা করব যেভাবে এক হিংস্র প্রাণী দেখে মানুষ

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। আর এমনটি হলে কেবল আমাদের ব্যবহারিক জীবনেই বিপ্লব আসবে না বরং আমরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করা এবং খোদার নিকটবর্তী করার মাধ্যম হতে সক্ষম হবে।

যাহোক স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে এ কথাগুলোর কিছুটা বিশদ বিবরণ আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। স্মরণ করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য বারবার আমাদের সামনে পুনরাবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রথম কথা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বলেছেন তাহলো, শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার।

একজন মু'মিন যে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান রাখে এবং সেই ঈমানের কারণে খোদার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুগ ইমামের হাতে যে বয়আত করছে এমন ব্যক্তি এবং শির্কের মাঝে দূরতম কোন সম্পর্কও থাকতে পারে না। এটি কীভাবে হতে পারে যে, একজন বহুশ্বরবাদী বা মুশরিক আল্লাহ্‌র কথা মানবে? কিন্তু বিষয় তা নয়, যে সূক্ষ্ম শির্কের দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সেটি বাহ্যিক কোন শির্ক নয় বরং প্রচ্ছন্ন এবং সুপ্ত শির্ক, যা এক মু'মিনের বিশ্বাসকে দুর্বল করে ফেলে।

বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন: **"মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আর হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা লালিত হবে, একেই তৌহীদ বা একত্ববাদ বলা হয় না। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও পরিকল্পনাকে খোদার সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের ওপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপর করা উচিত বা নিজের প্রবৃত্তি বা আমিত্বকে সে ততটা গুরুত্ব দেয় যতটা আল্লাহ্ তা'লাকে দেয়া উচিত; এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা বা মূর্তি পূজারী। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল বা পাথর দিয়ে যে প্রতিমা বানানো হয় এবং নির্ভর করা হয় কেবল তাকেই প্রতিমা বলে না বরং প্রত্যেক বস্তু বা কথা বা কর্ম যাকে খোদার মত গুরুত্ব দেয়া হয় তা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে প্রতিমা বা মূর্তি"।**

অতএব আজ আমাদের আত্ম অবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে, গত বছর আমরা যেসব পরিকল্পনা বা ধূর্ততার ওপর নির্ভর করেছি সেগুলোকেই কি সবকিছু মনে করেছি নাকি এগুলোকে আমরা পরিকল্পনা হিসেবে ব্যবহার করেছি আর আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়ে বা ঝুঁকে এগুলোর মাধ্যমে খোদা তা'লার কাছে কল্যাণ এবং বরকতের জন্য হাত পেতেছি। ন্যায় বা সুবিচারের দৃষ্টিকোন থেকে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ আমাদের অঙ্গীকারের প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরবে।

এছাড়া তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, আমরা মিথ্যা বলব না। এমন বিবেকবান কে আছে যে বলবে, মিথ্যা ভালো জিনিস বা আমি মিথ্যা বলতে চাই? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যতক্ষণ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয় মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না"**। অতএব কোন স্বার্থপরতা বা স্বার্থ যদি থাকে,

কোন কামনা-বাসনা যদি থাকে তবেই মানুষ মিথ্যার দিকে ঝুঁকে। কিন্তু উন্নত চারিত্রিক গুণ হলো প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মানও যদি হুমকিগ্রস্ত হয় তবুও মিথ্যা না বলা আর সত্যের আঁচল কখনো হাতছাড়া না করা। সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর পার্থক্য তো তখনই বুঝা যায় যখন মানুষ কোন পরীক্ষায় নিপতিত হয়। ব্যক্তিস্বার্থ হানি হওয়ার আশংকাও দেখা দিলেও সফলতার সাথে তা অতিক্রম করা এবং নিজের স্বার্থকে সত্যের খাতিরে জলাঞ্জলি দেয়া আবশ্যক।

আজকাল এখানে বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মানুষ এসাইলামের জন্য আসে বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে কিন্তু আমার বারবার বোঝানো সত্ত্বেও উকিলদের কথার ফাঁদে পা দিয়ে তারা মিথ্যা বলে বসে। মিথ্যাভিত্তিক কাহিনী গড়ে, তারপরও কিছু লোকের বরং অনেকেরই কেস প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আর এখানেও জামাতীভাবে উকিলদের কেন্দ্রীয় টিম আছে। তারা এসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য করে থাকেন। তাদেরকে উকিলদের কাছে পাঠায় বা এমন কিছু জরুরী কথা বা পরামর্শ তাদেরকে দেয় যা তাদের কেসের জন্য উপকারী হয়। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, কমিটির প্রেসিডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন, অমুক ব্যক্তির কেস প্রত্যাখ্যাত হবার কারণ হলো, চরম মিথ্যার ভিত্তিতে কেস দাঁড় করানো হয়েছিল। কেবলমাত্র একটি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর একথা চিন্তাও করে না যে, মিথ্যা এবং শির্ককে আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বা একত্রে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে অনেকেই বেনিফিটের খাতিরে বা অর্থনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা কথা বলে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: **"মিথ্যাও একটি মূর্তি বা প্রতিমা যার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরকারী আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা ছেড়ে দেয়"।**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **এই অঙ্গীকার করো যে, ব্যভিচার এড়িয়ে চলবে।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ব্যভিচারের ধারে-কাছেও ঘেষবে না অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠান মালা থেকে দূরে থাক যার ফলাফল স্বরূপ এমন ধারণা হৃদয়ে দানা বাধতে পারে আর সেসব পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এমন পাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে"।**

আজকাল টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে এমনসব নোংরা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় বা এগুলো অন করলে যা সামনে আসে তা চোখেরও ব্যভিচার আর চিন্তা ধারারও ব্যভিচার। আর এগুলো বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত করারও কারণ হয়ে থাকে। ঘর ভাঙ্গার কারণ হয়। অনেক মহিলা এবং মেয়েরা নিজেদের স্বামী সম্পর্কে লিখে, সারাদিন ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নোংরা ছবি বা চলচ্চিত্র দেখতে থাকে। অনেক পুরুষও তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ খোলা, তালাক পর্যন্ত বিষয় গড়ায়। বা এমনসব চলচ্চিত্র বা ফিল্মের কারণে মানুষ পশুর চেয়েও হীন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আহমদী সমাজ সার্বিকভাবে এটি থেকে মুক্ত। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এমন ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটে না। কিন্তু এমন সমাজে বসবাস করেও যদি এই নোংরামি থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা না করা হয় তাহলে কোন পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে না। তাই এ সম্পর্কেও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকটি যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো নোংরা দৃষ্টি পরিহার করব। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে গাযযে বসর বা দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন যেন নোংরা দৃষ্টিপাতের আশঙ্কাই দেখা না দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"সেই চোখের জন্য অগ্নিকে হারাম করা হয়েছে যা খোদা তা'লা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বা বস্তু দেখার পূর্বেই ঝুঁকে যায়"।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমাদের জন্য তাকিদপূর্ণ নির্দেশ হলো, আমরা যেন না মাহরাম মহিলাদের এবং তাদের সৌন্দর্য্যের স্থানগুলোকে না দেখি"**। তিনি আরো বলেন, **"আবশ্যকীয়ভাবে লাগামহীন দৃষ্টিপাতের ফলে কোন না কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। তাই যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা চান, আমাদের চোখ ও হৃদয় যেন আশঙ্কা বা হুমকি থেকে মুক্ত থাকে। এ কারণেই তিনি এই সুমহান শিক্ষা দিয়েছেন"**। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন: **"ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য বিধি-নিষেধের শর্ত মেনে চলা আবশ্যক করেছে। যেভাবে মহিলাদের পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একইভাবে পুরুষদেরও দৃষ্টি অবনত রাখার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"** এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা কতটা এর ওপর আমল করি।

এছাড়া তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকারও নিয়েছেন, আমরা সকল প্রকার পাপ ও অনাচার এবং কদাচার এড়িয়ে চলব। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াই হলো অবাধ্যতা, অনাচার এবং কদাচারে লিপ্ত হওয়া। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, **"কাউকে গালি দেয়া হলো অবাধ্যতা এবং পাপাচারের নামান্তর"**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়, কাফিরের পূর্বে ফাসেক বা পাপাচারি ও অবাধ্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া উচিত"**। তিনি বলেন, **"মুসলমানরা যখন অনাচার, কদাচার ও পাপাচারে সীমা লঙ্ঘন করে এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের অসম্মান ও অবমাননা করে এবং আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, আর জাগতিক ভোগ-বিলাসে যখন তারা মত্ত হয়েছে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও একইভাবে হালাকু এবং চেঙ্গিস খানদের মতো মানুষের হাতে ধ্বংস করিয়েছেন"**। আজকালও সারা পৃথিবীর মুসলমানদের একই অবস্থা।

আরেকটি ওয়াদা বা অঙ্গীকার যা বয়আত গ্রহণকারীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো, সে কখনও যুলুম বা অন্যায় করবে না। যুলুম বা অন্যায় অনেক বড় একটি পাপ। অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে পদদলিত করা বা কুক্ষিগত করা অনেক বড় একটি পাপ বা যুলুম। মহানবী (সা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, **কোন অন্যায় সবচেয়ে বড়?** তখন তিনি (সা.) বলেন, **"অন্যায়ভাবে নিজ ভাইয়ের সম্পত্তির এক হাত বা এক বিঘত পরিমান কুক্ষিগত করা হলো সবচেয়ে বড় যুলুম"**। তিনি (সা.) বলেন, **"এই জমির বা ভূমির একটি কঙ্করও যদি সে অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করে তাহলে সেই ভূমির নিম্নের সকল স্তরের বেড়ি বানিয়ে কিয়ামত দিবসে তার গলায় পড়িয়ে দেয়া হবে।"** অর্থাৎ সেই ভূমির নীচে গভীর পর্যন্ত যতগুলো মাটির

স্তর রয়েছে, নিচে আল্লাহ্ই জানেন, জমির কতগুলো স্তর আছে। তার একটি বেড়ি বানিয়ে কিয়ামত দিবসে তাকে অর্থাৎ এমন অন্যায়কারীর গলায় পরানো হবে। তাই এটি খুবই ভয়ের বিষয়। যারা বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমায় আমিত্বের বশবর্তী হয়ে বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষের অধিকার খর্ব করে তাদের ভেবে দেখা উচিত।

এরপর আমাদের কাছ থেকে আরো একটি অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, আমরা বিশ্বাস ঘাতকতা করব না। মহানবী (সা.) বিশ্বাস ঘাতকতা না করার কী মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, **"সেই ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করো না যে তোমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে।"**

এই মানে আমাদের উপনীত হতে হবে। কোন অজুহাত চলবে না যে, অমুকের আমানত এই কারণে আমি হস্তগত করেছি বা নষ্ট করেছি যে, সে অমুক সময় আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করেছে। নিজের অধিকারের জন্য কাযা বা বিচার বিভাগে যাও বা অপর পক্ষ যদি অ-আহমদী হয় তাহলে আদালতে যাও। জামাত যদি অনুমতি দেয় তাহলে আদালতে যান কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বাস ঘাতকতার ধারণাই মু'মিনের ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত করে।

এর পরের অঙ্গীকার হলো, সকল প্রকার ফাসাদ বা নৈরাজ্য পরিহার করব। স্বজনদের সাথে তো ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই উঠে না। যেসব অ-আহমদী কষ্ট দিচ্ছে তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা কী? তিনি বলেছেন, **"তোমরা খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামাতভুক্ত হয়েছ, যারা শুধু এ কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা বিবাদে লিপ্ত হবে না বরং নিভৃতে তাদের জন্য দোয়া কর"**। তিনি বলেন, **"দেখ আমি তোমাদেরকে বারবার এই দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, সকল প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং নৈরাজ্যকে এড়িয়ে চল আর গালি শুনে ধৈর্য প্রদর্শন কর। দুর্ব্যবহারের উত্তরে সদ্ব্যবহার কর আর কেউ যদি ফাসাদ বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় তাহলে সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম আর নমনীয়তার সাথে উত্তর দাও"**। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি যখন একথা শুনি যে, অমুক ব্যক্তি এই জামাতভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, এই রীতি আমি আদৌ পছন্দ করি না। আর খোদা তা'লাও চান না, যে-ই জামাত পৃথিবীতে একটি নমুনা এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে তা এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা তাক্বওয়া বিবর্জিত"**।

তাই আপন-পর কারো সাথে এমন ঝগড়াটে ব্যবহার করা যাবে না। আমাদের মাঝে যারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত, তারা যদি স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা ভাইদের সাথে সম্পর্কের গন্ডিতে বা তাদের নিজস্ব গন্ডিতে মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং নির্দেশকে সামনে রাখে তাহলে দু'একটি বিষয় যা

অভিযোগ আকারে সামনে আসে তাও আসার কথা নয়। বা অসাধারণভাবে এমন ঘটনা কমে যাওয়ার কথা।

আরো একটি অঙ্গীকার বা ওয়াদা যা আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো, আমরা বিদ্রোহের পথ পরিহার করব। এই বিদ্রোহী আচরণ তা জামাতের কোন সামান্য ওহ্‌দাদার বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হোক বা সরকারের বিরুদ্ধেই হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন আচরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন যা থেকে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ আসে। ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপকে বাদ দিয়ে, সরকারের অন্যান্য আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে এমন আচরণ প্রদর্শন করা যারফলে মানুষ আইন ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয় বা অন্যদের আইনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার নামান্তর হয় তা ইসলামী রীতি-নীতি বিবর্জিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, প্রবৃত্তির তাড়নার শিকারে পরিণত না হওয়ার অঙ্গীকার কর। পূর্বেও আমি বলেছি, আজকাল টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রবৃত্তির বা রিপুর তাড়নার শিকার হতে পারে। এরপর ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদিও এ কারণেই হয় যে, মানুষ প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করে বসে। অতএব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় যা কোন না কোন ভাবে মানুষকে রিপুর দাসত্বে প্রবৃত্ত করে তা থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এক আহমদীর দায়িত্ব।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আহমদীয়াতভুক্ত হয়ে তোমাদেরকে খোদার এই নির্দেশও মানতে হবে যে, পাঁচবেলার নামায এর সকল শর্ত স্বাপেক্ষে তোমরা পড়বে; এই অঙ্গীকারও কর। দশ বছর বয়স্কদের জন্যও নামায আবশ্যক। তাই পিতা-মাতার উচিত এক্ষেত্রে নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করা আর এই দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যখন পিতা-মাতা স্বয়ং নামাযের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হবেন। আমার কাছে অনেক অভিযোগ আসে। অনেক ছেলেমেয়েও লিখে, আমাদের পিতা-মাতা নামায পড়েন না বা স্ত্রীরা লিখেন, স্বামী নামায পড়ে না, বাচ্চাদের সামনে এ কেমন দৃষ্টান্ত ? পুরুষদের জন্য শর্ত স্বাপেক্ষে পাঁচবেলার নামায পড়ার অর্থ হলো, মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়া। অসুস্থতা বা অন্য কোন বৈধ কারণ যদি থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যদি একথার ওপরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই তাহলে আমাদের মসজিদগুলো নামাযীতে ভরে যাওয়ার কথা। শুধু ওহ্‌দাররাই যদি এ নির্দেশ মেনে চলতে আরম্ভ করে তাহলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি কিন্তু এখনো অনেক শূন্যতা রয়েছে, অনেক ঘাটতি রয়েছে, আর অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন। জামাতী ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গসংগঠনগুলোর এদিকে সমূহ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: **"যে ব্যক্তি নামায থেকে ছুটি নিতে চায় সে পশুর চেয়ে ভাল আর কী করেছে?"**। তার এবং পশুর মাঝে আর কোন পার্থক্য রইলো না। তাই প্রত্যেক আহমদীর গভীর সচেতনতার সাথে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এছাড়া তিনি আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন, আমরা তাহাজ্জুদ নামাযেরও ব্যবস্থা করবো। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাবস্থা করা উচিত**

কেননা; অতীতের পুণ্যবানদের রীতি এটিই ছিলো এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যমও এটি। এই অভ্যাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পাপ নিশ্চিহ্ন করে আর দৈহিক ব্যাধি থেকেও মানুষকে মুক্ত রাখে"।

অতএব তাহাজ্জুদ কেবল আধ্যাত্মিক চিকিৎসাই নয় বরং দৈহিক চিকিৎসাও বটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমাদের জামাতের উচিত তারা যেন তাহাজ্জুদকে আবশ্যকীয় করে নেয়। যারা বেশি পড়তে পারে না তারা দু'রাকাতই পড়ে নিক কেননা এতে সে অবশ্যই দোয়ার সুযোগ লাভ করবে। এ সময়ে কৃত দোয়ায় একটা বিশেষ প্রভাব এবং কার্যকারিতা রয়েছে"**। তাই এদিকেও আমাদের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের অঙ্গীকার নিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে বা দরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমতবারি বর্ষণ করবেন"**।

তাই দরূদ শরীফের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও দরূদ শরীফ একান্ত আবশ্যক। হযরত উমর (রা.) বলেন, **"দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে থেমে যায় আর যতক্ষণ তুমি তোমার নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ না কর এর কোন অংশই ঊর্ধ্বলোকে যায় না"**।

এরপর বয়আতের সময় আমরা আরো একটি অঙ্গীকার করি যে, রীতিমত ইস্তেগফার করবো। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি ইস্তেগফারে রত থাকে অর্থাৎ অনেক বেশি ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তা'লা সকল সঙ্কীর্ণতা বা প্রতিকুলতা থেকে তার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং সকল সমস্যার মুখে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন। আর এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দেন যা সে ভাবতেও পারে না"**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কিছু মানুষ এমন আছে যারা পাপ সম্পর্কে সচেতন আর কতক এমন আছে যারা পাপ যে করছে তা বুঝেইনা। তাই আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের বিধান রেখেছেন, প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, জানুক বা না জানুক মানুষ যেন সকল প্রকার পাপের জন্য ইস্তেগফারে রত থাকে"**। অতএব এই গুরুত্ব সবসময় আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকা চাই।

এরপর তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ রাখবো। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির মাঝে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন। খোদার এ অনুগ্রহের কথা যদি স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও সর্বদা অব্যাহত থাকবে এবং তাঁর কথা মানার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে।

এছাড়া এ অঙ্গীকারও রয়েছে, আমি সদা আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত থাকব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ বরকতশূন্য এবং অকার্যকর হয়ে যায় যদি তা খোদার প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হয়"**। মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, **"যে ব্যক্তি স্বল্পে**

কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বেশির জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না"।

তাই খোদা তা'লার প্রশংসা এমনভাবে করুন যেন আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

এরপর আমরা আরো একটি অঙ্গীকার করেছি যে, মোটের ওপর আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দেবো না। একই সাথে এ অঙ্গীকারও আমরা করেছি, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেবো না। যতটা সম্ভব মার্জনা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু বাধ্য হয়ে, কারও সীমাতিরিক্ত কষ্টদায়ক ব্যবহারের কারণে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে বা রাগের বশবর্তী হয়ে নয় বরং সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয় তাহলে বিষয় নিজের হাতে নিব না বরং শাসকদের কাছে কথা পৌঁছাতে হবে । সংশোধন যা করার ক্ষমতার বাগডোর যার হাতে তিনিই করবেন। প্রত্যেক যদুমধুর কাজ নয় যে, অন্যের সংশোধন করে বেড়াবে। স্বয়ং কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব না। বিনয়কে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বানাতে হবে।

এরপর এই অঙ্গীকারও রয়েছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। সুখ-দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখবো। এক হাদীসে আছে মহানবী (সা.) বলেছেন, **"মু'মিনের বিষয়ও বড় অদ্ভুত। তার সব কাজ আগা-গোড়া বরকত এবং কল্যাণকর হয়ে থাকে। এই কৃপা এবং ফযল শুধু মু'মিনের জন্যই নির্ধারিত। তার যদি কোন আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় তাহলে সে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর তার এই কৃতজ্ঞতা তার জন্য বর্ধিত কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে। আর যদি সে কোন দুঃখ-কষ্ট, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করে। তার এই কর্মপন্থা তার জন্য কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে কেননা; সে ধৈর্যের ফলে পুণ্যের ভাগী হয়"।**

তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পানে ধাবিত হওয়াই হলো এক মু'মিনের কাজ। আর এটি যদি হয় তাহলে আমাদের এই অঙ্গীকারও রক্ষা হবে যে, আমরা খোদা তা'লার পথে সকল লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছি এবং কখনও কোন সমস্যা আসলে আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যে আমার সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারণেও নয় আর মানুষের গালি ও দুর্ব্যবহারের কারণেও নয় আর উর্ধ্বলোক হতে আগত কোন পরীক্ষার কারণেও নয়।"** অতএব খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই হয়ে থাকব এবং এ জন্য আমরা চেষ্টা অব্যহত রাখব। আর দুঃখ এবং লাঞ্ছনারও যদি সম্মুখীন হই তবুও আমরা ভ্রুক্ষেপ করব না, এ হলো আমাদের অঙ্গীকার।

এছাড়া আরেকটি অঙ্গিকার হলো, আমরা সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথার অনুসরণ করব না। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে এমন কোন কুপ্রথার সূচনা করে যার**

ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই সেই কদাচার বা কুপ্রথা প্রত্যাখ্যাত এবং অগ্রহণযোগ্য।" অতএব এ সম্পর্কে আমাদের সদা সচেতন থাকতে হবে। আজকাল বিয়ে-শাদির বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক কদাচার বা কুপ্রথা দেখা যায়। আহমদীদের এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। ডানে-বামে দেখে বা অন্যদের দেখে সেসব কুপ্রথায় আমাদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ সম্পর্কে আমি একবার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তরবীয়ত সেক্রেটারীদের এবং লাজনাদের উচিত হবে বিভিন্ন সময়ে এমনসব বিষয়াদি জামাতের সামনে রাখা যেন অগ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাজ্য বিষয় থেকে জামাতের সদস্যরা মুক্ত থাকে।

আরেকটা অঙ্গীকার হল, কখনও কামনা-বাসনার অনুকরণ করব না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যে কেউ নিজের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে তার নিবাস হবে জান্নাত। কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হল, আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হওয়া আর এর মাধ্যমে মানুষ খোদার সন্তুষ্টি লাভ করে এ পৃথিবীতেই জান্নাতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে"।**

এছাড়া আরেকটি অঙ্গীকার রয়েছে, কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরধার্য করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"অতএব তোমরা সাবধান থাক আর আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা এবং কুরআনের পথ-নির্দেশনার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নিও না। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশ' নির্দেশাবলীর একটি সামান্য নির্দেশকেও অবজ্ঞা করে সে নিজ হাতে নিজের জন্য মুক্তির দ্বার বন্ধ করে দেয়"।**

এরপর আরেকটি অঙ্গীকার হলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশকে আমরা নিজেদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে অবলম্বন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমাদের রসূল কেবল একজনই আর একমাত্র কুরআনই এই রসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুসরণ এবং আনুগত্যের কল্যাণে আমরা খোদাকে পেতে পারি"।** অতএব এটি অর্জনের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

এছাড়া আরেকটি অঙ্গীকার রয়েছে, অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমি সত্য সত্যই বলছি, কিয়ামত দিবসে শির্কের পর অহংকারের মত এত বড় সমস্য এবং আপদ আর নেই। এটি এমন এক বিপদ যা উভয় জগতে মানুষকে লাঞ্ছিত করে"।** তাই সত্যিই ভয়ের বিষয়। তিনি (আ.) আরও বলেন, **"আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি, অহংকার পরিহার কর কেননা; অহংকার আমাদের মহা প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণ্য একটি কাজ"।**

এছাড়া এই অঙ্গীকারও নেয়া হয়েছে যে, নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র খাতিরে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি করবেন, তাকে উন্নত করবেন আর এক পর্যায়ে সে ইল্লীয়ীনদের মাঝে স্থান পাবে"।** বিনয় অবলম্বন করলে পদমর্যাদা একগুণ করে বৃদ্ধি পাবে এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এমন মানুষকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মকাম বা পর্যায়ে স্থান দেয়া হবে।

আরেকটি অঙ্গীকার হলো, সর্বদা সদাচরণ হবে আমাদের বৈশিষ্ট্য। সবাইকে এটিও সামনে রাখতে হবে।

আরেকটি অঙ্গীকার হলো, দীনতা, বিনয় এবং সহিষ্ণুতার মাঝে জীবন যাপন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যদি খোদা তা'লাকে সন্ধান করতে হয় তবে দীনহীনদের হৃদয়ের পাশে বা তাদের মাঝে সন্ধান কর"।**

এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.) আরেকটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজের ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি এবং সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করব।

এছাড়া এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি সর্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা নেকী এবং পুণ্যকে গভীরভাবে ভালোবাসেন আর তিনি চান তাঁর সৃষ্টির সাথে যেন সহানুভূতি প্রর্দশন করা হয়। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমরা স্মরণ রাখবে, তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে তা সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, বিনা ব্যতিক্রমে সবার উপকার কর কেননা এটিই কুরআনের শিক্ষা"।**

তিনি (আ.) আরো অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে মানব জাতির হিত সাধন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"সৃষ্টির যত অভাব অনটন আছে আর আদি বন্টনকারী বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে যেভাবে কতককে কতকের মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন, সেসব ক্ষেত্রে শুধু খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকার সহানুভূতির প্রেরণায় যতটা সম্ভব মানুষের উপকার করা উচিত আর সকল অভাবীকে খোদা প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে সাহায্য দেয়া উচিত। আর যুগপৎ তাদের ইহ এবং পরকালের নিশ্চয়তার জন্য স্বীয় শক্তি সামর্থকে কাজে লাগানো উচিত"।** অতএব পৃথিবীর আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্ট করাও মানব জাতির হিত সাধনের অর্ন্তভুক্ত বিষয় আর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার কল্যাণ সাধন করা আমাদের দায়িত্ব। অতএব যেখানে বাহ্যিক সহানুভূতি এবং সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে, উপকার করতে হবে, মানব জাতির খিদমত করতে হবে সেখানে মানব জাতির কল্যাণের জন্য তবলীগের দায়িত্ব পালন করাও আহমদীদের জন্য আবশ্যক।

এছাড়া তিনি এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে তার (আ.) সাথে এমন এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেক্ষেত্রে আনুগত্যের সেই মানে আমাদের পৌঁছতে হবে যা কোন জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় না আর কোন সেবকের সেবকসূলভ আচরণেও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের সেসব কথার আনুগত্য করতে হবে যা তিনি আমাদের ধর্মীয়, জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক তরবীয়তের জন্য লিখে গেছেন বা তারপর খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে জামাতের সদস্য পর্যন্ত তা পৌঁছে এবং যার উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। যা কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ এবং আদর্শ

সম্মত। এছাড়া না আমাদের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব আর না-ই আমাদের ঐক্য অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে।

তাই আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, গত বছর আমরা নিজেদের অঙ্গীকার কতটা পালন করেছি আর এক্ষেত্রে যদি কোন ত্রুটি বা ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে এ বছর সেই ঘাটতি আমরা কীভাবে পূরণ করব?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **“সে-ই আমাদের জামাতভুক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে। আর নিজের সংকল্প এবং সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করে”।**

আল্লাহ্ তা’লা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করতঃ আমাদের গত বছরের দুর্বলতা সমূহ ক্ষমা করুন। আর এ বছর অধিক সচেতনতার সাথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমাদের জীবনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করার তৌফিক দান করুন।

আজকে নামাযের পর দু’জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা আমাদের শহীদ ভাইয়ের। তার নাম হলো, জনাব লোকমান শেহ্যাদ সাহেব। তার পিতার নাম আল্লাদিত্তা সাহেব। গুজরানওয়ালার ভেড়িশাহ্ রহমানে জামাতের বিরোধীরা ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ফজরের নামাযের পর গুলি করে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

লোকমান শেহ্যাদ সাহেব নিজ বংশে একাই বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ২০০৭ সনের ২৭শে নভেম্বর বয়আত করে জামাতভুক্ত হয়েছিলেন। বয়আতের পূর্বে শহীদ মরহুমের নিজ অঞ্চলের আহমদীদের সাথে অনেক বেশি উঠাবসা ছিল। ভেড়িশাহ্ রহমান জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সুলতান আহমদ সাহেবকে গ্রামের লোকজনের সাথে আলোচনা করতে দেখে এবং জামাতের সাফল্য দেখে আর যুক্তি-প্রমাণ শোনার পর প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর তিনি সচরাচর এমটিএ’র বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতেন আর বিশেষ করে আমার খুতবা শোনা আরম্ভ করেন। আর এটিই তার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়েছে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাকে ভয়াবহ বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিরোধীরা আহমদীয়াত ত্যাগ করানোর চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখেনি। শহীদ মরহুমকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া এবং হুমকি-ধামকি দেয়া ছাড়াও অনেক মৌলভীর মুখোমুখি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লার ফযলে কোন মৌলভীই তার সামনে দাঁড়াতে পারেনি। একবার তার ফুপা জোর করে তাকে স্থানীয় মসজিদে নিয়ে যায় যেখানে আগে থেকেই কয়েকজন মৌলভী বসে ছিল। আহমদীয়াত ত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকলে শহীদ মরহুম বলেন, এরা যদি যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে যে, আহমদীয়া জামাত মিথ্যা তাহলে আমি আহমদীয়াত ছেড়ে দিব। মৌলভীরা তখন বলে, এখন বিতর্কের সময় শেষ হয়ে গেছে। তুমি এখন শুধু জামাতকে অস্বীকারের কথা ঘোষণা কর। কোন বিতর্ক হবে না। কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। শহীদ মরহুমের না মানার কারণে তার ফুপা এবং সেখানে উপস্থিত মৌলভীরা আর অন্যান্য লোকেরা তাকে লাঠি ইত্যাদি দিয়ে পেটাতে আরম্ভ করে যার ফলে তার

মেরুদন্ডে প্রচন্ড আঘাত লাগে এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। বিরোধীরা তাকে মারতে মারতে একটি গাড়িতে তুলে তার চাচার কাছে নিয়ে যায় এবং পশু রাখার আবদ্ধ স্থানে তাকে আটকে রাখে। তার মায়ের কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছায় তখন তিনি চাচার খামার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে ফেরত দিতে বলেন। প্রথমে চাচা অস্বীকার করে। তার মাকেও থাপ্পড় মারে অথচ তিনি আহমদী ছিলেন না। মায়ের চাপ দেয়ার পর শহীদ মরহুমকে তার মায়ের হাতে তুলে দেয়া হয় আর একই সাথে বলে, আজ থেকে তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। শহীদ মরহুমের বয়আতের এক বছর পর তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক তার পিতার কাছে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয় যেন আহমদীয়াত থেকে ফেরানো যায়। সৌদি আরবেও তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে কেননা; তার সৌদি আরব পৌঁছার পূর্বেই আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে তার আহমদীয়াত গ্রহণের সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। শহীদ মরহুম সৌদি আরবেও জামাতের সন্ধান অব্যাহত রাখেন। বেশ কয়েক মাস চেষ্টার পরে একজন ভারতীয় আহমদী বন্ধুর মাধ্যমে জামাতের সাথে তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ মরহুম এতে গভীরভাবে আনন্দিত হন আর সেখানে অবস্থানকালে তিনি হজ্জ্ব করার সৌভাগ্যও লাভ করেন। তিন বছর পর শহীদ মরহুম সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং নিজের কৃষি কাজ আরম্ভ করেন। ২০১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর ভেড়িশাহ্ রহমানে জামাতের বিরোধীরা খতমে নবুয়ত সম্মেলন করে যাতে সারা দেশ থেকে নামধারী মৌলভীরা অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে মৌলভীরা জামাতের বিরুদ্ধে ওয়াজেবুল কতলের ফতওয়া দেয় আর বিশেষ করে লোকমান শেহ্যাদ সাহেবের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এই সম্মেলনের পর বিরোধীদের পক্ষ থেকে তাকে অনবরত হুমকি দেয়া হচ্ছিল। অবশেষে ২৭শে ডিসেম্বর ফজরের নামাযের পর তিনি যখন নিজের খামার বাড়িতে যাচ্ছিলেন বিরোধীরা পিছু ধাওয়া করে পিছন থেকে তাঁর মাথায় গুলি করে এরফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হাসাপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে পথিমধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম ১৯৮৯ সনের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম এক উন্নত ঈমানদার, সৎ হৃদয়ের অধিকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ভদ্র ও মিশুক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ যুবক ছিলেন। ভেড়িশাহ্ রহমান জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবে খিদমত করার তৌফিক পাচ্ছিলেন। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক গভীর আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করতেন। তবলীগের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। আহমদী বন্ধুদেরকে বলতেন, আমার বন্ধু হলো সে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে। শহীদ মরহুম বলতেন, আমি সত্যিকার অর্থে প্রশান্তি তখন লাভ করব যখন আমার পুরো ঘরকে জামাতভুক্ত করতে পারব। তার মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশি বিরোধী মহিলা বলেন, আমি এই ছেলের ভেতর আহমদীয়াত গ্রহণের পর এক অসাধারণ পরিবর্তন দেখেছি। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে এই ছেলে তাহাজ্জুদ পড়া আরম্ভ করেছিল। রীতিমত রাত তিনটায় তার ঘরের লাইট জ্বলে উঠত আর আমি যখন তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে

বকাঝকা করতাম তখন শহীদ মরহুমের মাও আমার সাথে রাগান্বিত হতেন। তখন শহীদ মরহুম মাকে বলতেন, এসব কথা তো এখন আমাদের শুনতে হবে, এটি এখন আমাদের অদৃষ্ট।

এখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি শুনেছি, বিরোধীরা যাই বলুক না কেন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে আর শহীদ মরহুম এ কথাই তার মাকে বলেছেন অথচ মা আহমদী ছিলেন না। তিনি বলেন, মা! আমার কারণে এসব কথা আপনাকে শুনতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রশংসনীয় জায়গায় তাকে স্থান দিন। তার পরিবারকেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতের নূরে আলোকিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

রাফি বাট সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, শাহাদাতের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাবওয়ায় আমার কাছে আসেন আর পুরো সময় জামাতের উন্নতি এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। তার মাঝে তবলীগের এক উম্মাদনা ছিল। আমি তাকে বাবুল আবওয়াব মহল্লায় এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাই। সেখানে বিভিন্ন রেফারেন্স এর নোটবুক দেখে তার আনন্দের সীমা ছিল না এবং নিজের মোবাইলে অনেক রেফারেন্স এর ছবি উঠিয়ে নেন আর বলেন, অচিরেই আমি ফিরে আসব আর তার কাছে মূল্যবান যে ভান্ডার আছে সেটি থেকে লাভবান হব।

লোকমান শেহযাদ সাহেবের বিশেষ একটি দিক ছিল, তিনি প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করতেন যার কারণে তার আধ্যাত্মিকতার অসাধারণ উন্নতি হয়। তার সাহচর্যে বসার পর প্রত্যেক ব্যক্তি এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সেখান থেকে যেত।

জামাতের মুরুব্বী আলমাস মাহমুদ নাসের সাহেব লিখেন, লোকমান সাহেব সেই গ্রামের সাথে সম্পর্ক রাখেন যেখানে এই অধম জামেয়ার পড়াশুনা শেষ করার পর প্রথমবার নিযুক্ত হই। লোকমান সাহেব এই অধমের কাছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন অথচ তিনি তখনও বয়আত করেন নি। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করার প্রক্রিয়ায় তিনি জামাতের এত কাছে এসে গিয়েছিলেন যে, আলোচনাকালে নিজেকে জামাতে আহমদীয়ার সদস্য মনে করতেন আর আহমদী এবং অ-আহমদীর মাঝে পার্থক্যের আলোচনায় নিজেকে আহমদী হিসেবে উপস্থাপন করতেন। বয়আতের সময় স্বল্প বয়স্ক যুবক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সাহসী যুবক ছিলেন। অনেক মার খেয়েছেন যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। তার ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইনি আরও লিখেন, মসজিদে যখন তাকে মারা হয়েছে তখন লাঠি এবং রেহেল দ্বারা পেটানো হয়েছে, রেহেল যার ওপর কুরআন শরীফ রেখে পড়া হয় সেই রেহেল দিয়েও পেটানো হয়েছে। বন্দুকের মুখে তাকে অপহরনও করা হয়েছে এবং গোয়াল ঘরে নিয়ে রাখা হয়েছে যেখান থেকে তার মা তাকে ছাড়িয়ে এনেছেন। তখন কোন ডাক্তারও ছিল না। তার এক অ-আহমদী ডাক্তার বন্ধু গোপনে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন বা চিকিৎসা করেছেন।

ইনি আরও লিখেন, এই অধম গভীরভাবে অনুভব করেছি, লোকমান সাহেব পাহাড়ের মতো দৃঢ়চেতার অধিকারী ছিলেন। সকল প্রকার যুলুম এবং বর্বর আচরণ সত্ত্বেও আদৌ বিচলিত ছিলেন না এবং কখনও দোদুল্যমানও হননি বরং অসাধারণ মনোবল এবং ধৈর্য প্রদর্শন করতঃ সাহাবীদের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

রানা রউফ সাহেব সৌদি আরব থেকে লিখেন, জামাতের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন কিন্তু কফিল অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিসা ইস্যু করত তার কারণে চিন্তিত থাকতেন। কফিলকে তার আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মীরা প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে এবং বলেছে, এই ব্যক্তি কাফির। কিন্তু কফিল তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি অবসর সময় সারাদিন কুরআন পড়ে এবং সময়মত নামায পড়ে। এ আবার কেমন কাফির? অথচ তোমরা নামাযও পড় না আর কুরআনও পড় না। বিশেষ করে জীবন-জীবিকার সমস্যা এবং আহমদীয়াতের কারণে আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

সৌদি আরবে অবস্থানকারী তার গ্রামের এক আহমদী বন্ধু ইমতিয়ায সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্পকাল পর তার নানার বাড়িতে কারও ইন্তেকাল হয়। তখন তার মামারা অ-আহমদী মৌলভীদের একত্রিত করে এবং লোকমান আহমদকে সেখানে নিয়ে যায়। লোকমান সাহেব তার পকেটে আহমদীয়া পকেট বুক রাখতেন। অ-আহমদী মৌলভীরা বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন নিয়ে তার সাথে বিতর্ক আরম্ভ করে আর তিনি যুক্তি প্রমাণের আলোকে উত্তর দিতে থাকেন। পরে মৌলভীরা হৈচৈ আরম্ভ করলে তার অ-আহমদী এক প্রবীণ ব্যক্তি মৌলভীদের বলেন, এক ছেলে তোমাদের সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এ অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে এবং যুক্তি প্রমাণের আলোকে উত্তর দিচ্ছে। তাই তোমরাও হৈচৈ করো না বরং এক এক করে তার প্রশ্নের উত্তর দাও। কিন্তু কোন উত্তর থাকলে তো তারা দিবে।

প্রথমবার সৌদি আরবের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার পর তিনি বলেন, স্বপ্নে এই দৃশ্য আমি পূর্বেই দেখেছি।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা হবে শ্রদ্ধেয়া শেহযাদী সুতিয়ানুসকা সাহেবার। ইনি মেসিডোনিয়ার অধিবাসিনী। তিনি ২০১৪ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৯৬ সনে স্বামীর আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েক মাস পর তিনি বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৫ সনের মার্চ এবং এপ্রিলে শরীফ দুরুস্কী সাহেব এবং শাহেদ আহমদ সাহেব জার্মানী থেকে এক তবলীগি সফরে বেরুভ যান যেখানে শরীফ দুরুস্কী সাহেব মরহুমার স্বামী এবং নিজের এক আত্মীয় জনাব জাফর আহমদের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছান এবং তারা তা তারা গ্রহণ করেন। মরহুমার স্বামী বলেন, তার বিয়ের দশ বারো বছর পার হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিলো না। শাহেদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র কাছে তার জন্য দোয়ার চিঠি লিখেন। এর কিছুকাল পর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেন। প্রথম দিকে এখানে আহমদীরা বিরোধিতা এবং সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে নামায পড়া জানতেন না। আহমদী হওয়ার পর তিনি নামায শিখেছেন। স্থানীয় লাজনার সক্রিয় সদস্যা হিসেবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। নিষ্ঠাবান আহমদী মহিলা ছিলেন। নামায সেন্টারের সাথে রীতিমত যোগাযোগ ছিল। জামাতী অনুষ্ঠানাদিতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। মুবাল্লিগদের নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন। স্থানীয় ভাষায় যে বই পুস্তক ছাপা হতো সেগুলো সবসময় পড়তেন। মেসিডোনিয়ায় আমাদের সেন্টার না থাকার কারণে তার ইন্তেকালের পর অ আহমদী মসজিদে তাকে গোসল দেয়ার জন্য নিয়ে গেলে তারা লাশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর জানাযাও তারাই পড়েছে আর আহমদীদেরকে জানাযা পড়তে দেয়া হয়নি। পরে আহমদীরা গায়েবানা জানাযা পড়েছে। যাহোক তার স্বামী খুবই সৎসাহস এবং দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করেছেন। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হন নি কেননা; ফিৎনা-ফাসাদের আশংকা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার মাগফিরাত করুন আর তার সন্তান এবং স্বামীকেও নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং তাক্বওয়ায় উন্নতি দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।